লোকশিল্পচর্চায় মাটির পুতুল

শুভঙ্কর মণ্ডল

মাটির পুতুল বৈচিত্র্যময় লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লোকশিল্পের জন্ম প্রয়োজনের নিরিখে হলেও শিল্পীর শৈল্পিক দক্ষতায় ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির আশীর্বাদে সে যেন পরিণত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির স্নেহধন্য, পৃথিবীর বুকে লালিত হওয়া এই মানুষ একসময় মাটি ও পাথরকেই তার সৃষ্টির প্রথম উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে সময়-প্রবাহে চলতে চলতে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল সমাজের দ্বারা মানুষ সর্বদাই প্রভাবিত হয়ে এসেছে। তার প্রভাব পরেছে স্রষ্টার সৃষ্টিতেও। মাটির পুতুল যার একটি অন্যতম উদাহরণ। ছেলে ভোলানো এই মৃৎ-পুতুলগুলি শুধুমাত্র যে শিশু-মনোরঞ্জনে সহায়ক তাই নয়, বরং এগুলি শিল্পীর পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বিনোদন ইত্যাদি নানাদিকের বর্ণময় চিত্রকে তুলে ধরে। কখনও কখনও এর সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগ, বিশ্বাস, সংস্কার, লৌকিক-অলৌকিক-জাদু সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ। কখনও তারা কোনো এক প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক সাক্ষীস্বরূপ হয়ে ওঠে। যেমন, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রাপ্ত মৃৎ-পুতুল ও খেলনাগুলির কথা বলা যায়। কখনও আবার তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ও একটি নির্দিষ্ট সমাজের গল্প বলে। কৃষ্ণনগরের বাস্তবধর্মী মাটির পুতুলে যেমন শ্রমজীবী মানুষের কর্মনির্ভর জীবনধারা উদ্ভাসিত হয় তেমনই জয়নগর-মজিলপুরের পুতুলে ফুটে ওঠে ব্রিটিশপর্বের বাবু-বিবি সংস্কৃতি। হাওড়ার রানিপুতুলের মধ্যে অনেক গবেষক খুঁজে পান ইংল্যান্ডেশ্বরী রানি ভিক্টোরিয়ার প্রতিচ্ছবি[১]। আবার কালীঘাট, কুমোরটুলি, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পুতুল-সমাজে স্থান পায় সমকালের খুঁটিনাটি। এক্ষেত্রে বেলুনওয়ালা, আইসক্রিম-বিক্রেতা, সাইকেল-আরোহী, রন্ধনরত মহিলা, ছিপধারী বাবু, তারকেশ্বর যাত্রী, ট্রাফিক-পুলিশ ইত্যাদি বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

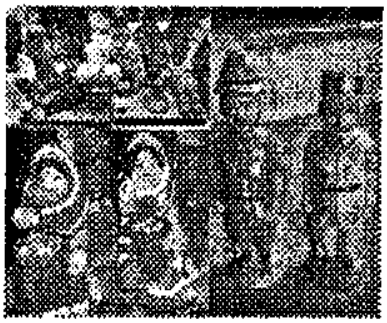

'পুতুল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'প্রধানত খেলার সামগ্রীরূপে নির্মিত মানুষ ও জীবজন্তুর

প্রতিমূর্তি।'[২] তবে এই ব্যাখ্যা সামগ্রিকার্থে গ্রহণযোগ্য হলেও কিছুক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও ঘটে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, ঘরন্দা প্রভৃতি উৎসব-পার্বণে এমন কিছু পুতুল নির্মিত হয়; যেখানে দেবদেবী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির পাশাপাশি ঘর-বাড়ি, গৃহস্থালির নানাবিধ সামগ্রী, যানবাহন ইত্যাদিও থাকে। তবে এগুলিকে খেলনা বলাই শ্রেয়। আবার অনেক পুতুলের ক্ষেত্রে সংকরায়ন ও মিশ্র-উপস্থাপনাও চোখে পড়ে। মৃৎ-পুতুল সম্পর্কে বিধান বিশ্বাস বলেছেন—"পুতুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আগে সে শিশুতোষ খেলনা তারপরে দেব ভাবনায় জারিত প্রতিমূর্তি। মাঝখানে ব্যবহারিক দ্রব্যে তার ছাপ।"[৩]

• মাটির পুতুলের শ্রেণিবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গের মৃৎ-পুতুলচর্চা

ভারতবর্ষের মৃৎ-পুতুলকে স্টেলা ক্রামরিশ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—কালোত্তীর্ণ এবং সময়োচিত। তারাপদ সাঁতরা স্টেলা ক্রামরিশ বর্ণিত এই বিভাজনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সময়োচিত পুতুলের মধ্যে একটি সমকালীন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে এবং তাকে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট করা যাবে। অপরপক্ষে কালোত্তীর্ণ পুতুলের সঙ্গে প্রাক সিন্ধু সভ্যতার পোড়ামাটির পুতুলের সাদৃশ্য থাকবে।[৪] বাংলার ঘরে ঘরে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে মা-ঠাকুরমারা শিশুদের ভোলাতে অথবা ব্রত-পার্বণের অনুষঙ্গ রূপে হাতে টিপে-ঠেসে যে মৃৎ-পুতুলের সৃষ্টি করে আসছেন সেগুলিকে এই কালোত্তীর্ণ পুতুলের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। আবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর, মজিলপুর, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মাটির পুতুলকে সময়োচিত পুতুলের দলভুক্ত করা যেতে পারে। বিষয়গত দিক থেকে মৃৎ-পুতুল বৈচিত্র্যে ভরপুর। যথা—মনুষ্যাবয়বাকৃতি, দেবদেবীকেন্দ্রিক, পশুপাখি, সংকর প্রজাতির, মিশ্র বিষয়ধর্মী ও অন্যান্য। আবার ধর্মীয় প্রভাবের নিরিখে এগুলি দু'প্রকার।

১. ধর্মীয় প্রভাবান্বিত : যেমন, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি-পুতুল এবং মানসিক পূরণের নিমিত্তে দেবস্থানে উৎসর্গীকৃত দেবতা অথবা পশুপাখির ছোটো ছোটো প্রতিমূর্তি বা ছলন।
২. ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত : যেমন—সামাজিক বিষয়ধর্মী পুতুল, খেলনা-পুতুল, পশুপাখি, প্রতিকৃতিমূলক মূর্তি-পুতুল ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যগত ও ব্যবহারিক দিক থেকেও মৃৎ-পুতুলকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন—খেলার পুতুল, প্রতিমা ও ছলন, লৌকিক-অলৌকিক-জাদু-সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পুতুল, সংরক্ষিত বস্তুরূপে, গৃহসজ্জার পুতুল ইত্যাদি। পদ্ধতিগত দিক থেকে মাটির পুতুল মোটামুটি পাঁচ প্রকার।

প্রথমত॥ হাতে তৈরি টেপা-পুতুল। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হাতের দক্ষতায় ও আঙ্গুলের সহায়তায় নিরেট পুতুলগুলি গড়ে ওঠে। সহজ সরল উপস্থাপনাই এই পুতুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ মেদিনীপুরের ষষ্ঠীপুতুল, মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়ার পুতুল, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার রেলপুতুল ও থানে উৎসর্গীকৃত ছোটো ছোটো হাতি-ঘোড়া প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে[৫]। এগুলি একবর্ণীয় ও রঙিন উভয়ই হয়।

দ্বিতীয়ত॥ ছাঁচে নির্মিত পুতুল। এইধরনের পুতুলের ক্ষেত্রে শিল্পী সর্বাগ্রে একটি মাটির

মূর্তি অথবা পুতুল বানিয়ে সেটি থেকেই কাঙ্ক্ষিত ছাঁচটি গড়ে নেন। এই ছাঁচ সাধারণত দু'ধরনের—একখোল এবং দু'খোল বিশিষ্ট ছাঁচ।

আগে মুলত মাটি দিয়ে ছাঁচ বানানো হতো। বর্তমানে এগুলির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য বেশিরভাগ ছাঁচই প্লাস্টার-অফ-প্যারিসের মাধ্যমে নির্মিত হয়। ছাঁচে পুতুল নির্মাণের পর তা রোদে শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মতো ভাটিতে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তবে কাঁচামাটির পুতুল পোড়ানো হয় না। পুতুলে রং করার পূর্বে খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। রং ও খড়িমাটির বন্ধক হিসেবে তেঁতুলবিচির আঠা, বেলের আঠা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। পুতুলগুলিকে রং করার জন্য বিভিন্ন ভেষজ রং, বাজারজাত সস্তার গুঁড়ো রং থেকে শুরু করে, বাজারের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক রং, স্প্রে-রং ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। কলকাতার বিধাননগরের দক্ষিণদাঁড়ি, কালীঘাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর, মজিলপুর, শিখরবালি, মথুরাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মৃৎ-পুতুল এই ছাঁচের পুতুলের একেকটি অনন্য উদাহরণ।

আবার অনেক পুতুল ছাঁচে তৈরি হলেও সেগুলিতে টেপা-পুতুলের ছাপ থেকেই যায়। যেমন, হাওড়ার রানিপুতুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেয়েপুতুল প্রভৃতি। এগুলি সম্পূর্ণ ছাঁচে তৈরি হলেও এগুলির হাত ঠিক টেপা-পুতুলের মতো। দেহ থেকে খানিকটা বাইরের দিকে বর্ধিত।

তৃতীয়ত॥ চাকে তৈরি পুতুল। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সেন্দড়া, সোনামুখী, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা, বেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কুমোরের চাকে তৈরি ঐতিহ্যবাহী হাতি-ঘোড়া, ষাঁড়, বাঘ ইত্যাদি এই পুতুলের সর্বোৎকৃষ্টতম উদাহরণ।[৬]

চতুর্থত॥ মিশ্র মাধ্যমে তৈরি পুতুল। এক্ষেত্রে পুতুলের কিয়দংশ চাকে, কিয়দংশ ছাঁচে কিংবা কিয়দংশ হাতে টিপে তৈরি করা হয়। যেমন, কুমোরটুলিতে গণগৌর ব্রত উপলক্ষ্যে যে পুতুলগুলি বানানো হয় সেগুলির মুখমণ্ডলসহ দেহকাণ্ড এবং হাতগুলি আলাদা আলাদা ভাবে ছাঁচে তৈরি করে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

আহিরীটোলার প্রজাপতি সম্প্রদায়ের কিছু শিল্পীও এইভাবে পুতুল বানিয়ে থাকেন। আবার মেদিনীপুরের দেওয়ালী পুতুলগুলির[৭] নিম্নাংশ কুমোরের চাকায় তৈরি হলেও ঊর্ধ্বাংশ কখনও হাতে, আবার কখনও ছাঁচে তৈরি করা হয়। একইভাবে এই পুতুলের মাথার ও হাতের প্রদীপগুলি আলাদা ভাবে বানিয়ে নিয়ে সেগুলি পুতুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে এগুলি দীপলক্ষ্মী নামেও বিশেষ পরিচিত।

পঞ্চমত॥ কাঠামোর মূর্তি-পুতুল। কাঠামোয় তৈরি দেব-দেবীর প্রতিমাগুলিই এই শাখার কেন্দ্রীয় চরিত্র। এক্ষেত্রে একটি আরমেচারে খড় বেঁধে তার উপর মাটির প্রলেপের সাহায্যে প্রতিমার প্রাথমিক আদল তৈরি করা হয়। চূড়ান্ত কাজগুলি মিহি মাটির প্রলেপে সম্পন্ন হয়। প্রতিমাগুলিকে প্রয়োজনানুসারে রঞ্জিত করার পর রঙিন কাপড়, শোলার সাজ, জড়ির সাজ ইত্যাদির সাহায্যে অলংকৃত করা হয়। অনেক পটুয়াশিল্পী আবার সম্পূর্ণ মাটির সাজেই মনোমুগ্ধকর প্রতিমা সৃষ্টি করে থাকেন। এই ধরনের প্রতিমার ক্ষেত্রে তার মুখমণ্ডল, হাতপায়ের আঙ্গুল, মাটির সাজ ইত্যাদি ছাঁচে বানিয়ে নেওয়া হয়। কুমোরটুলি এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের তৈরি প্রতিমাগুলি এই পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বর্ণানুযায়ী মৃৎ-পুতুলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, রঙিন পুতুল।

দ্বিতীয়ত, একবর্ণীয় পুতুল। অনেকক্ষেত্রে পুতুল পোড়ানোর আগে এগুলির গায়ে বনকমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। বনকমাটির ব্যবহারের ফলে পোড়ানোর পর পুতুলগুলি লালচে বর্ণ ধারণ করে। আবার তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে এগুলি কখনও বাদামি আবার কখনও কৃষ্ণবর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়া ও অন্যান্য পুতুল।

তৃতীয়ত, দ্বি-বর্ণযুক্ত পুতুল, অর্থাৎ পুতুলকে রঞ্জিত করতে সর্বসাকুল্যে দু'টি রঙ ব্যবহৃত হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাজপুর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা হাতে টিপে একধরনের পিরের ঘোড়া বানিয়ে থাকেন। এগুলিতে খড়িমাটির প্রলেপ লাগানোর পর ভুসোকালি দিয়ে কয়েকটি রেখা টেনে অলংকরণ করা হয়।

চতুর্থত, বর্ণহীন পুতুল, অর্থাৎ পুতুলগুলিকে শুধুমাত্র মাটি দিয়ে গড়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রং করা হয় না।

আবার বার্নিশের ভিত্তিতে মৃৎ-পুতুল দু'প্রকার। যথা, বার্নিশবিহীন ও বার্নিশযুক্ত। পুতুলের রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে বার্নিশ ব্যবহৃত হয়। অনেকে বার্নিশ করার আগে অ্যারারুটের প্রলেপ লাগিয়ে নেন। যেমন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রামমাটি-গোপালনগরের শিল্পীরা এই পদ্ধতিতেই তাঁদের পুতুলে বার্নিশ করেন।

স্থিরতার ভিত্তিতে মাটির পুতুল ও খেলনাকে স্থির পুতুল, চলমান খেলনা-পুতুল ও দোদুল্যমান পুতুল—এভাবে ভাগ করা যেতে পারে। চলমান খেলনা-পুতুল বলতে চাকাওয়ালা পুতুল, খেলনা-গাড়ি, চাকাযুক্ত ঘোড়া ইত্যাদিকে বোঝায়। এগুলি কাঁচামাটি ও পোড়ামাটি দু'ধরনেরই হয়। মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এইধরনের শিশুতোষ খেলনা তৈরি করা হয়। দোদুল্যমান পুতুলের মধ্যে সর্বাগ্রে আছে মাথা-নাড়ানো পুতুল। এগুলির মাথাটি স্প্রিং-এর সাহায্যে দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকায় একটু হাওয়া অথবা একটু টোকা লাগলেই তা দুলতে থাকে। তবে এই পুতুল-পরিবারে প্রবীণরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়া সুতোর সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা যায় এমন মাটির পাখির ঝাঁক, দড়ি বাঁধা মাটির ছোট ছোট পুতুল ইত্যাদির কথা বলা যায় যেগুলি গৃহসজ্জায় সহায়ক।

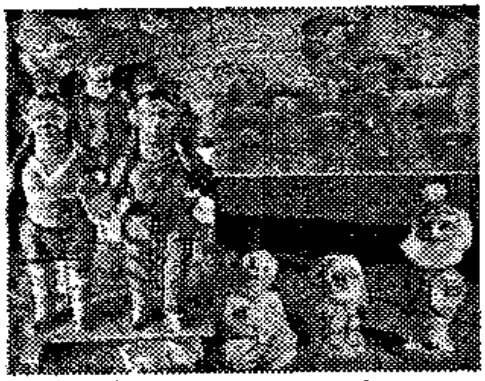

• ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে মৃৎ-পুতুলচর্চা

উড়িষ্যার গঞ্জাম, কোরাপুট, নৌরঙ্গপুর, পুরীসহ কয়েকটি জেলায় গোবরের জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামসহ বিভিন্ন দেবদেবীর ও পশুপাখির পুতুল তৈরি করা হয়। সম্বলপুরের বারগড় জেলার বারপলিতে মৃৎশিল্পীরা 'খাপ্পার' নামে একধরনের টালি বানিয়ে থাকেন। এগুলির উপরে গোলাকার গড়নযুক্ত হনুমান, হাতি, ইঁদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর অভিব্যক্তিময় ত্রিমাত্রিক মূর্তি-পুতুল যুক্ত করা হয়। স্থানীয় বিশ্বাস যে, এই ধরনের পুতুলগুলি গৃহে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এছাড়া সোনপুরে 'লঙ্কাপুরী হনুমান' নামে একধরনের চতুষ্পদ বিশিষ্ট হনুমানের মূর্তি-পুতুল তৈরি করা হয়। কুম্ভকারের চাকে তৈরি এই পুতুলের নিম্নমুখী পা গুলিতে ছিদ্র করা থাকে। ভাদ্র অমাবস্যার লঙ্কাদহনোৎসবের শোভাযাত্রায় ওই ছিদ্রগুলিতে লাঠি ঢুকিয়ে, মূর্তিটিকে কাঁধে চাপিয়ে সারা গ্রামে ঘোরানো হয়।[৮]

ছত্তিশগড় সারগুজা ও রাইগড়ের গ্রাম্য মহিলারা তাঁদের গৃহের শোভা বর্ধনের জন্য ঘরের দেওয়ালের বাহ্যপরিসরে বিবিধ বর্ণময় আলঙ্কারিক রিলিফওয়ার্ক করে থাকেন। অনেক সময় দেওয়াল সাজানো অথবা শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা কাঁচামাটির বর্ণোজ্জ্বল পুতুলও গড়ে থাকেন।[৯]

মধ্যপ্রদেশ ঝাবুয়া জেলার আলিরাজপুরের মৃৎশিল্পীরা তাঁদের পোড়ামাটির 'ঘোড়া' ও 'ধাবা' নামক গম্বুজাকৃতি ছোটো ছোটো পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণের জন্য বিশেষ পরিচিত। এগুলি বাপদেব নামক স্থানীয় দেবতার থানে ছলন হিসাবে অর্পিত হয়।[১০] মাণ্ডলার বেশকিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে পোড়ামাটির প্রতীকী মুখোশ ও নানারকমের পুতুলের ব্যবহার প্রচলিত আছে। মাণ্ডলার কোঙ্গিয়া, বিরদিয়া, রেওয়াই, মালবিয়া এবং সুঙ্গারে সম্প্রদায়ের কুমোরশিল্পীরা এই ধরনের ধর্মীয় পুতুল ও অন্যান্য বিষয়গুলি বানিয়ে থাকেন।[১১]

রাজস্থানের নাগৌরের মাণ্ডওয়া তহশিলে গণগৌর ব্রতোৎসবের উদ্দেশ্যে কাঠের পাশাপাশি ইশার-গোরার (হর-পার্বতী) মৃৎ-মূর্তিও শিল্পীরা বানান। এগুলির নিম্নাংশ চাকে ও ঊর্ধ্বাংশ হাতে টিপে তৈরি। এছাড়া জয়সলমীরের পোখারানের খেলনা ও পুতুল, উদয়পুরের রাজসামান্দ জেলার মোলেলার টেরাকোটা রিলিফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১২]

মহারাষ্ট্রের পুনের ঔরঙ্গাবাদ, আহমেদনগর, নাগপুর, মুম্বাই শহরের ধারাবি প্রভৃতি অঞ্চলে গৃহস্থালির মাটির বাসনপত্রের পাশাপাশি ছোটো ছোটো পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি

ইত্যাদি তৈরি করা হয়। মহারাষ্ট্রের কৃষি-উৎসব 'ব্যায়েল-পোলা'তে উৎসবের প্রতীক স্বরূপ শিশুদের বর্ণময় মাটির ষাঁড় ও অন্যান্য পুতুল উপহার দেওয়ার রীতি বহুল প্রচলিত।[১৩]

উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের বুলন্দশাহ জেলার খুরজা ও লখনউ-এর ছিনহাটে সেরামিকের বাসনপত্র ছাড়াও নানারকমের সেরামিকের পুতুল ও খেলনা পাওয়া যায়। লখনউ-এর মাটির পাখি, ফলমূল ইত্যাদি বর্ণময় খেলনাগুলি একেকটি অভিনিবেশযোগ্য লোকশিল্পবস্তু। গোরক্ষপুর ও দেওরিয়া জেলায় চাকে ও হাতের সাহায্য নির্মিত পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়ার বেশ মিল পাওয়া যায়। এগুলি সবই একবর্ণীয় এবং মানসিক চোকাতে দেবস্থানে উৎসর্গ করা হয়।[১৪] তবে অন্ধ্রপ্রদেশের অউরভিল্লেতে উৎসর্গীকরণের জন্য নির্মিত ঘোড়াগুলি একটু ব্যতিক্রমী। কারণ এগুলি বর্ণময়।[১৫] তামিলনাড়ুর বিভিন্ন গ্রামে গ্রাম-দেবতা আয়্যানারের মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির ছলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ঘোড়া (গ্রামাথু কুট্টীরাই), হাতি (আম্বারি ইয়ান্নাই), আয়্যানারের সেনাবাহিনী (ভিড়ান), আয়্যানারের এককমূর্তি ইত্যাদি। এগুলি বেশিরভাগই চাকে তৈরি, লোহিতবর্ণযুক্ত।[১৬] এছাড়া ছত্তিশগড়ের বাস্তারের কুম্ভকারের ঘোড়া-হাতি-বাঘ[১৭], বিহারের মধুবনীর দারভাঙ্গার আরোহীসহ হাতি-ঘোড়া[১৮], গুজরাটের ভাদোদরার তেজগড়, ছোটা উদয়পুর, দেবহাট প্রভৃতি অঞ্চলের ঘোড়া, সুরাতের ঘোড়া[১৯], অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পালামনের ও মাদানাপাল্লিতে কুম্বারা সম্প্রদায়ের নির্মিত হাতি-ঘোড়া[২০] প্রভৃতিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

অন্ধ্রপ্রদেশের কোণ্ডাপাল্লী ও তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুরের নর্তকী, রাজা-রানি, বুড়ো-বুড়ি ইত্যাদি চরিত্রবিশিষ্ট দ্যোদুল্যমান পুতুলগুলি দক্ষিণী লোকশিল্প শৈলীর একেকটি হীরকতুল্য উপাদান। তাঞ্জাভুরের পুতুলগুলি 'তাঞ্জাভুর থালাইয়াত্তি বোম্মাই' নামে সর্বজনবিদিত। আলঙ্কারিক গুণসমৃদ্ধ এই পুতুলগুলি সেখানকার ঐতিহ্যময় আভিজাত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[২১]। এছাড়াও অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কমবেশি মৃৎ-পুতুল তৈরি করা হয়।

এই মাটির পুতুলের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের সৃজনশীলতা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ জ্ঞান সম্পর্কে যেমন একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়, তেমনই এই ধরনের লোকশিল্প বস্তুগুলির মধ্য দিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারাবিবরণীও উদ্ভাসিত হয়। লোকশিল্পবস্তু নির্মাণের নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বংশপরম্পরায় এক শিল্পী হতে অন্য শিল্পীতে সঞ্চারিত হতে থাকে।[২২]

উৎসের সন্ধানে

১. শুভঙ্কর মণ্ডল : 'রানিপুতুল বা মেয়েপুতুল বাংলার লোকশিল্পের এক ঐতিহ্যবাহী ধারা', কৌলাল, স্বপন কুমার ঠাকুর সম্পাদিত, ই-ম্যাগাজিন, পূর্ব বর্ধমান, ২২ জুলাই ২০২০ http://bengali.koulal.com/raniputul-ba-meyeputul-banglar-lokshilper-ek-oitiyabahi-dhara/

২. সুভাষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত ২০০২, পৃ. ৫২৫